দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 MAY 1987 পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত একটি সেমিনারে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আখলাকুজ্জামান। 'বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য' লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জমান। অধ্যাপক সুলভ সংযত ভাষায় লিখিত এই প্রবন্ধটিতে এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা ধরনের বৈষম্যের উল্লেখ করা হয়। বলা বাহুল্য, শুধু বাংলাদেশের মতো আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা পুঁজিবাদী দেশে নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও এখন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কমবেশি বৈষম্য বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ। গ্রেট-বৃটেনে শতকরা ১০ ভাগ। আমাদের দেশের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। প্রবন্ধ লেখক ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাত দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ, বাকী ৭৬ ভাগ নিরক্ষর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়স্ক শিশুদের শতকরা মাত্র ৬৬ জন পাঠশালায় যায়, কিন্তু যারা পাঠশালায় নাম লেখায় তাদের মধ্যেও ১ম ও ২য় শ্রেণী হতেই শতকরা ৬০ ভাগ বিদায় গ্রহণ করে। পঞ্চম শ্রেণী হতে বিদায় গ্রহণ করে শতকরা ৮০ ভাগ। হিসেবটা ১৯৮০ সালের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বইয়ের বরাত দিয়ে ডক্টর আনিসুজ্জমান জানান, "১৯৮৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি এক লাখ এবং ৫-৯ বয়োবর্গের জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী। অপরপক্ষে BANBEIS-এর (বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিকস) হিসেবে, ১৯৮০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮২ লাখের বেশি, ১৯৮৫ তে তা ৮৯ লাখের কিছু বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান করা যায়।" ডক্টর আনিসুজ্জমান মন্তব্য করছেন, "দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২,১৭ থেকে ২,৬ শতাংশের মধ্যে) গণ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বয়োবর্গের হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শতাংশ ৬৬-র চেয়ে কম হতে পারে।" উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কোন পরিসংখ্যান খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। ডক্টর আনিসুজ্জামান একটি আধা সরকারী নমুনা জরিপের বরাত দিয়ে বলছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যে সংখ্যার কথা সরকার বলছেন তার মধ্যে অতিরঞ্জনের ভাগ শতকরা ২২'৮৪ শতাংশ।

এ-তো গেল বিষয়টার এক-দিক। পৃথিবীর উন্নত ও সুসভ্য দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) একটা বেশ বড় অংশ ব্যয় করা হয়। ইউনিসেফের সুপারিশ কমপক্ষে শতকরা ৭ ভাগ। বাংলাদেশে ব্যয় করা মাত্র শতকরা ১'৪ ভাগ। পক্ষান্তরে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। বৈষম্য শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্যে সরকার বছরে ব্যয় করে ৭৬ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্যে সরকার ব্যয় করেন বছরে ১০ হাজার ৩৩৩ টাকা। সরকারী কলেজের একজন ছাত্রের জন্যে সরকার ব্যয় করেন বছরে ২ হাজার ১শ' টাকা। বেসরকারী কলেজে ছাত্র-পিছু ব্যয় করেন মাত্র ২১০ টাকা। তা' ছাড়া শিক্ষাখাতে ব্যয়িত মোট অর্থের শতকরা ৭০ ভাগ শহরবাসীদের জন্যে ব্যয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের অধিকাংশ শহরে অবস্থিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান এসব বৈষম্য ছাড়াও দেশে কয়েক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন সাধারণ লোকের জন্যে সাধারণ পাঠশালা, হাই স্কুল ও কলেজ, কোরকানিয়া মাদ্রাসা, খারিজি মাদ্রাসা, সরকারী নেয়াব অনুযায়ী পরিচালিত সরকারী ও বেসরকারী মাদ্রাসা প্রভৃতি। অপরদিকে অসাধারণ অর্থাৎ বিত্তবান শাসকশ্রেণীর লোকদের জন্যে আছে ইংরেজী ও বাংলা মিডিয়ামের ব্যয়বহুল কিণ্ডারগার্টেন, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, কলেজ, মন মস্তিষ্ক হতে বাঙালীত্বের চেতনা বিলুপ্ত করার বিশেষ লক্ষ্যে বিদেশী অর্থে পরিচালিত বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রভৃতি। বহু বিত্তবান এই বৈষম্যেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা "বাবা লোগ" এবং "মিসিবাবাদের" পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকায় পাঠান বিদ্যাশিক্ষার জন্য। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ শাসন করার বিশেষ লক্ষ্যেই দেশে অসাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বালক বালিকাদের পশ্চিম ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় শিক্ষা দেয়া হয় এই বিশেষ লক্ষ্যেই।

দেশবাসীর চোখের সামনেই এই বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। সুতরাং তাঁরা সব কিছু জানেন এবং বোঝেন। ডক্টর আনিসুজ্জমান তাঁর প্রবন্ধে বিষয়টার প্রতি নতুন করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাত্র।

এ বিষয়ে এই কলামে ইতিপূর্বে বহুবার লিখেছি। কোনো ফল হয়নি। তাই ডক্টর আনিসুজ্জমানের মূল্যবান প্রবন্ধটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গত ৮ই মে তারিখের কোনো কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমানের একটি বক্তৃতা পাঠ করার পর আনিসুজ্জমানের প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ল। মন্ত্রী বলেছেন, নবগঠিত শিক্ষা কমিশন না কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে গঠিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও মূল্যায়ন করবে।

কমিশন গঠিত হওয়ার কথা শোনামাত্র আমার চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় যে, তা ভদ্রভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। চল্লিশ বছর আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পনের বছর আগে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খাঁর আগের কালটায় একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তারা যথারীতি রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল করেন। ক্ষমতা জবর দখল করার পর আইয়ুব খাঁ অন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনও যথারীতি রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গঠন করেন ডক্টর কুদরতে খুদাকে চেয়ারম্যান করে নতুন এক শিক্ষা কমিশন। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে কাজী জাফর ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী। তখন শিক্ষা নীতি সম্পর্কে একটি ওয়ার্কশপ খোলা হয়। সেখানে বহু শিক্ষাবিদ বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন, বোধ করি রিপোর্ট ও তৈরী করেছিলেন। এই জিমনাষ্টিকসে লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। বলা বাহুল্য, গরীব জনসাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স হতেই ঐ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরে ক্ষমতায় এসেছেন এরশাদ সাহেব। তাঁর রাজত্বকাল দু'ভাগে বিভক্ত। তাঁর নবগঠিত সরকারে কাজী জাফর শুধু মন্ত্রী নন, উপ-প্রধানমন্ত্রীও। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নন। শিক্ষামন্ত্রী আগে ছিলেন একজন। তিনি বরখাস্ত হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন মাহবুবুর রহমান। এরশাদ সাহেবের শাসনামলের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে অতি সম্প্রতি নতুন একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। এ দেশের শিক্ষিত মহল ভালো করেই জানেন যে, পাকিস্তানী আমলে গঠিত দু'টি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেও কোনো কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আমলে গঠিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট এবং জিয়াউর রহমান আমলের বিপুল ব্যয়বহুল শিক্ষা ওয়ার্কশপের রিপোর্ট ও কার্যকর করা হয়নি।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, সরকারী মহল কি দেশবাসীকে বোকা জ্ঞান করেন? ডক্টর কুদরতে খুদা এবং তাঁর সংগে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ কি বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন যে তারা কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্ট মূল্যায়ন করবেন? হত্যা ও ক্যুর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা জবরদখল করা যায়, রাস্তাঘাট হতে মন্ত্রীও কুড়িয়ে নেয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাশালী রাতারাতি সৃষ্টি হয় না। তজ্জন্য অনেক সাধনা করতে হয়, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্টে দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান সুপারিশ ছিল। তাঁরা বলেছিলেন, মোট জাতীয় আয়ের অন্ততঃ পাঁচ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ দেশে একরকম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এই সুপারিশগুলো সম্বন্ধে বর্তমান সরকার রহস্যজনকভাবে নীরব। তার পরিবর্তে তারা পারেন তো প্রতি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ ধাপ্পাবাজির মাধ্যমে শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে হাতে রাখার চেষ্টা করছেন। মাদ্রাসা নামীয় বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করে সরলমনা ধর্মনিষ্ঠ দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যয়বহুল কিণ্ডারগার্টেন এবং ক্যাডেট স্কুল-কলেজগুলোর অস্তিত্বকে জনগণের রোষদৃষ্টির বাইরে রাখছেন।

একজন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর খ্যাতি ছিল। এখনও উপমহাদেশের জ্ঞানীগুণী মহলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহর রচনা হতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন হতে আটত্রিশ বছর পূর্বে পাকিস্তানী ও তথাকথিত ইসলামী জজবা যখন উত্তুঙ্গে তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন: 'সাবেক প্রথায় বাংলাদেশে এখনও তিনটি শিক্ষা প্রণালী আছে এবং তাহা সরকারের অনুমোদিত-নিউ স্কীম মাদ্রাসা, ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা। ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু গণ্ডগোলই সৃষ্টি করিয়াছে এবং মুসলমান সমাজে অনৈক্য আনয়ন করিয়াছে - -- আজাদ পাকিস্তানে ইহাদের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন বরং হাস্যকর এবং লজ্জাকরও বটে। পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে সরকার একাধিক শিক্ষাপ্রণালী কখনও মঞ্জুর করেন না।' ডক্টর শহীদুল্লাহ মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণ করেননি। কিন্তু কি প্রকৃত ধর্মবোধে কি আরবি ফারসি উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন মাদ্রাসার মুদাররেসদের বাবা।

পাকিস্তান আমলে যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল সেগুলোর সুপারিশ ছিল সম্পূর্ণরূপে গণবিরোধী। শিক্ষা সঙ্কোচন ও শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত ওইসব 'শিক্ষানীতি' এদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে প্রতিহত করে। স্বাধীনতার পর ডঃ কুদরতে খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেই কেবল জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব সুপারিশের রূপ লাভ করে এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পায়। '৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যাদর্শের সাথে সাথে এই রিপোর্টের সুপারিশগুলোও পরিত্যক্ত হয়। তার স্থলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে সাবেক পাকিস্তান আমলের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ঐ নীতির ফসল। মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম মাত্র চার বছর আগের ঘটনা। ক্ষমতাসীনরা যে কিছুই ভুলেন নি এবং কিছুই শেখেননি, নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠন তারই নির্ভুল প্রমাণ।

"কাটা ঘায়ে নুন ছিটানো" বলে একটা প্রবচন আছে। মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্টের মূল্যায়ন করা হবে বলে ঠিক সে কাজটিই করেছেন। কথায় কথায় যখন তখন যে কোনো জাতীয় সমস্যা-বিষয়ে কমিশন গঠন তথা সমস্যা চাপা দিয়ে স্বশ্রেণীর আখের গুছানোর ধাপ্পাবাজিতে দেশের বা জনগণের কোন কল্যাণ হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার যদি সত্যিই কিছু করতে চান তাহলে নতুন নতুন কমিশন গঠনের পরিবর্তে কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের কাজেই হাত দেয়া উচিত।